Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 366 – 371
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

'নবান্ন' নাটকে প্রতিবাদের আলোড়ন

রাজেশ সরকার
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : rajeshsarkar1190@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, অনাহার, লড়াই-সংগ্রাম, নারীর আত্ম-সম্মান, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ।

Abstract
বাংলা নাট্য জগতে এক প্রবাদপ্রতিম মানুষ হলেন বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর লেখা 'নবান্ন' নাটকটিকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নাটক হিসেবে বিবেচিত করা হয়। অস্থির রাজনীতির ভেতর 'নবান্ন' নাটকের জন্ম। তখনো বাঙালির রঙ্গশালা উজ্জ্বলিত ছিল না তা নয়। সেই সময়টাতে অধিকাংশ নাটকের কাহিনি ছিল প্রধানত রাজা-রানিদের কাহিনি, পুরাণ ও ইতিহাসের চর্বিতচর্বণ। সামাজিক নাটক একেবারেই যে ছিল না তাও নয়, কিন্তু সেখানে মধ্যবিত্ত জীবনের গুটিকয়েক কল্পিত সমস্যা ছাড়া ব্যাপকভাবে জনজীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়নি। অর্থাৎ দেব-দেবী নির্ভর কাহিনি থেকে বেরিয়ে এলেও একেবারে মাটির কাছাকাছি থাকা জনজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেনি কোনো নাট্যকারের হাতে 'নবান্ন' নাটকের মতো। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সুযোগ নিয়ে একদল স্বার্থান্বেষী ও সুযোগ সন্ধানী মানুষ কালোবাজারি করে। পণ্যের অবৈধ মজুদ করে সাধারণ মানুষকে অবাধ শোষণ করে চলেছে। নর ও নারী দুজনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাতেই সমাজ এবং সংসার সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত হয়। পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে পুরুষের সঙ্গে নারীও নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর পরিশ্রমের যথার্থ মূল্য বা সম্মান দেয়নি। সমাজ বা সংসারে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নারীকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, অভাব, অনাহারে ক্লিষ্ট পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে তার আত্মসম্মান রক্ষা করতে কীভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে তার জীবন্ত প্রমাণ 'নবান্ন' নাটকের পঞ্চাননী, রাধিকা, বিনোদিনী। তাদের সেই লড়াই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও চলছে। কিন্তু তারপরেও এই নাটকের একদম শেষ পর্যায়ে একদল মানুষ সমস্ত দুঃখ দূর্দশাকে সরিয়ে রেখে 'নবান্ন' উৎসবে মেতে ওঠে।

Discussion

ভারতবর্ষে যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হতে থাকে তখন জমিদার শ্রেণীর অবলুপ্তির সঙ্গে গ্রামগঞ্জে গড়ে ওঠা সৌখিন নাট্যশালা তার পুরাতন গৌরব হারাতে থাকে। এই পালাবদলের হাওয়ায় বাংলা নাটকের আদি ও মধ্য পর্বের পৌরাণিক ঐতিহাসিক রোমান্স প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে রচিত অসংখ্য নাটকের 'পুণ্যের জয়, পাপের ক্ষয়' এই ভাববোধ দর্শকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হতে থাকে। অন্যদিকে নাটক ও নাট্য মঞ্চের ওপরে চলচ্চিত্রে সর্বগ্রাসী প্রভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকলে বাংলার মঞ্চ পরিবেশ অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে নাট্যমোদী একদল যুবক চল্লিশের দশক থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন একটা ভাবোন্মাদনা নিয়ে আসেন। এই ভাবোন্মাদনা ক্রমে আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে, যা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে 'গণনাট্য' আন্দোলন হিসেবে পরিচিত, এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে,

> "গতানুগতিক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের আওতায় থেকেই তার সংস্কারের প্রচেষ্টা এদেশের গণনাট্যের উদ্ভব নয়, তার উদ্ভব হয়েছে সমাজ মানুষের এক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারণে।"[১]

এই আন্দোলন শুধু আমাদের নাট্য সাহিত্যের ওপরেই প্রভাব বিস্তার করেনি বরং বাংলার অর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধে এনে দিয়েছে গণসচেতনতার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে গণনাট্য আন্দোলন ও বিজন ভট্টাচার্যের নামটি সমার্থক হয়ে উঠেছিল। মন্বন্তরের পটভূমিকায় সমকালীন যুগ যন্ত্রনা ও বাঙালি জীবনের নানা অনুষঙ্গ নাটকে যে মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছিল তা আর কোথাও দেখা যায় না। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ স্বাধীনতা প্রাপ্তির উন্মত্ত বাসনায় উত্তাল ভারতবর্ষের সাধারণ জনজীবন যখন বিভ্রান্ত, সেই সময় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে সারা বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সমগ্র বাংলা প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। শস্য–শ্যামলা সমগ্র বাংলা জুড়ে ফুটে উঠেছিল অভাব, অনাহার, ক্ষুধাতুর মানুষের করুন জীবনচিত্র। সেই বিধ্বস্ত বাংলার দুর্ভিক্ষের ক্ষুধাতুর সাধারণ বঙ্গবাসীর করুন অবস্থার কথা উঠে এসেছে এই 'নবান্ন' নাটকে। 'নবান্ন' নাটকের একদিকে ফুটে উঠেছে কালোবাজারি এবং স্বার্থপর শ্রেণীর গভীর চক্রান্তের কথা, অন্যদিকে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ। যা সব চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্ন করে সাধারণ মানুষের অধিকারকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাই নবান্ন নাটক প্রসঙ্গে বলা যায়–

> "'নবান্ন' নাটকের প্রথম থেকেই দুর্গতি ও দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্ভাবনা গড়ে তোলা হয়েছে। নাটক শেষও হয়েছে প্রতিরোধের মধ্যেই। 'নবান্ন' নাটক তাই শুধু দুর্গতির নাটক নয়, প্রতিরোধেরও নাটক।"[২]

দুর্ভিক্ষ, অনাহার, কালোবাজারি, চক্রান্ত সবকিছুর বিরুদ্ধে গ্রাম বাংলার মানুষ জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এই প্রতিরোধ শুধু পুরুষরা একাই গড়ে তোলেনি, গ্রাম বাংলার নারীরাও পুরুষের পাশে থেকে তাদের শক্তি, সাহস, উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। জীবন রক্ষার এক চরম সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়েও নারী সমাজ এবং সংসার রক্ষার জন্য যে দায়বদ্ধ তা তারা কখনো বিস্মৃত হয়নি। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সমাজ এবং সংসার রক্ষার পাশাপাশি আত্মসম্মান এবং নিজের অধিকার রক্ষাতেও নারীকে অবিচল থাকতে হয়েছে। কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে স্বার্থপর সমাজ ও পরিস্থিতির সঙ্গে। তার জীবন্ত প্রমাণ পঞ্চাননী, রাধিকা, বিনোদিনীর মতো গ্রাম বাংলার সহস্র সংগ্রামী নারীরা। দুর্ভিক্ষ অনাহার সাধারণ জনজীবনকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে করেছিল তা উঠে এসেছে নাটকে প্রধান, কুঞ্জ, নিরঞ্জন, দয়াল, রাধিকা, বরকতের সংলাপে দুর্ভিক্ষ- অনাহারে মৃত্যুই ছিল সাধারণ মানুষের অনিবার্য পরিণতি দুর্ভিক্ষের সেই মৃত্যুর ভয়াবহতা পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে রাধিকার সংলাপে –

> "দেখছো কি, কিছু কি থাকলো! হুঃ, উজোর হয়ে গেল গাঁ। উত্তর পাড়ায় তো সে একেবারে, থাক আর নাম করবো না একেবারে ছেয়ে গেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে একবিন্দু জল যে গালে দেবে তা পর্যন্ত কেউ নেই। কি যে সব হবে! এমন আঁকালও দেখিনি এমন মৃত্যুও দেখিনি কোনদিন।"[৩]

মৃত্যুর ভয়াবহতা সাধারণ জনমানুষকে শিহরিত করে। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে অনাহারে মৃত্যুই ছিল সাধারণ মানুষের অনিবার্য পরিণতি সেই চরম পরিণতি স্বীকার করে নেওয়ায় ছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত সুজন, ফকির, বুধে, বরকতদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। পরিস্থিতির নির্মম পরিহাস মেনে নিয়েই বরকতকে আমরা বলতে শুনি,

"মরা তো হয়েছে হাতের পাঁচ গেলেই হল!"[৪]

গ্রাম বাংলার সহস্র নারীরা সেদিন পুরুষের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করে সমাজকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিল এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় -

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"[৫]

কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই বাণী যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক পৃথিবী তথা আধুনিক সভ্যতা এবং সমাজকে সুন্দর করে তুলতে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পুরুষদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে চলছে নারী। তবে শুধু আধুনিক সময়ে নয় পুরুষের সঙ্গে নারীর পা মিলিয়ে চলা অনেক আগে থেকেই। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে, পরিবারের কল্যাণে নারী সদা-সর্বদা কর্ম তৎপর থেকেছে। তবে নারীর এই কর্মতৎপরতা গৃহকেন্দ্রিক। সংসার পরিচালনা তথা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চালিত করায় নারীর মূল কাজ হিসেবে বিবেচিত এবং নির্দেশিত থেকেছে। তাই নিরন্তর কর্মতৎপরতার পরেও নারী তার যথাযথ সম্মান কখনোই সমাজ থেকে ফিরে পায়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধিকার, সম্মান বরাবরই লুণ্ঠিত হয়েছে। সমাজের কল্যাণে নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেও নারী তার প্রাপ্য সম্মান না পেলেও অনেক সময়ই প্রতিবাদী হয়ে নিজের অধিকার দাবি করতে পারেনি। নারীর এই অক্ষমতার মূল কারণ তাদের সামাজিক সীমাবদ্ধতা, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর বঞ্চনার কারণ অনুসন্ধান বিষয়ে আন্নদাশঙ্কর রায় তার পারিবারিক 'নারী সমস্যা' প্রবন্ধে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কথা তুলে ধরেছেন-

> "স্ত্রী পুরুষই যখন পরিবার গঠন, করে তখন স্বামীর উপরে থাকে অর্থ সংগ্রহের ভার, স্ত্রীর উপরে অর্থ ব্যয়ের। তাই নারীকে কোন কালে স্বাবলম্বন শিক্ষা করতে হয় না, স্বামীর অভাবে পরিবার চালাবার সামর্থ্যও অর্জন করতে হয় না,এইটেই তার যত দুঃখের কারণ। সে চায় পুরুষের আশ্রয়, তাই তাকে দাম দিতে হয় আত্মমর্যাদা। পুরুষের আশ্রয়ের বিনিময়ে সে আত্ম বিক্রয় করে, পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তাই অধিকার দাবি করার অধিকার তার নাই।"[৬]

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই মত যথার্থ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী তার অধিকার কোন দিনই পায়নি। তবে শুধু অধিকারই শুধু নয়, আর্থিক পরনির্ভরশীলতার জন্য নারী সমাজ এবং সংসারে যথাযথ সম্মানটুকুও সর্বদা পায়নি। সমাজ এবং সংসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে পা মিলিয়েও নিজের অধিকার এবং সম্মানের জন্য নারীকে বরাবরই লড়াই করতে হয়েছে। লড়াই করেই সমাজে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। তবে নারীর সেই লড়াই অত্যন্ত কঠিন হলেও নারী সেই লড়াইয়ের ভূমি ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। নারীর অধিকার এবং আত্মসম্মানের লড়াই-এর সেই প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের অন্যতম নাটক 'নবান্ন'-তে।

পরাধীনতার যন্ত্রণা, আগস্ট আন্দোলনের উন্মাদনা, দুর্ভিক্ষের হাহাকার, কালোবাজারিদের দৌরাত্মে বাংলার সাধারণ জনজীবন যখন বিধ্বস্ত সেই প্রেক্ষাপটেই বিজন ভট্টাচার্য তার 'নবান্ন' নাটক লিখেছেন। এখানে উল্লেখ্য 'নবান্ন' নাটকটি গণনাট্য আন্দোলনে নতুন জোয়ার এনেছিল। 'নবান্ন' গ্রাম বাংলার নতুন অন্নের উৎসব, নাট্যকার তেমন এক নতুনের শুভ সূচনার বার্তায় দিয়েছেন সম্মিলিত প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে তার 'নবান্ন' নাটকে। সেই প্রতিরোধ শুধুমাত্র গ্রাম বাংলার পুরুষরাই করেছে তা নয় নারীরাও তাদের সঙ্গে প্রতিরোধে শামিল হয়েছে পুরুষকে উৎসাহ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে অধিকার ছিনিয়ে নিতে। বাংলার দুর্ভিক্ষের, দুর্দশার চরম মুহূর্তে সেই সাহসী এবং উৎসাহী নারীর প্রতিমূর্তি আমরা দেখতে পাই প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননীর মধ্যে। নাটকের স্বল্প পরিসরে তার উপস্থিতি থাকলেও তিনি শক্তি সাহস এবং উৎসাহের উৎস রূপে ফুটে উঠেছে। বয়সের কাছে হার না মেনে সন্তান হারানোর যন্ত্রনা বুকে নিয়েও জীবন ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পঞ্চাননী দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দারিদ্রতা যে সাধারণ মানুষের নিত্য সঙ্গী

এবং আত্মসম্মান তাদের শুধু অহংকার নয় জীবন যাপনের অবলম্বন সেই কথা পঞ্চাননী জানে। আমরা তাই পঞ্চাননীর কণ্ঠে শুনি-

> "প্রধান - সহ্য করতে এয়েছ সহ্য করে যাও। মুখ বুজে সহ্য করে যাও, কোন কথা কয়ো না। কোনকথা কয়ো না, অধর্ম হবে। মুখ বুজে... পঞ্চাননী-তার আর বলবে কি। আজ তিনদিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটিনি, বুঝলে! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোন কথা না। কিন্তু শরম! লজ্জা! তোমাদের দেশের মেয়ে মানষের অঙ্গের ভূষণ! যা নিয়ে তোমরা গর্ব কর! আর তারপর সবচাইতে বড় কথা ইজ্জত! মেয়ে মানুষের ইজ্জত! কী, কথা বলিস না যে! চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁ রা কুঞ্জ, কুঞ্জ কুঞ্জ!"[৭]

অভাব অনাহার এর মধ্যেও পঞ্চাননী আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইয়ে নিজেও সামিল হয়েছে এবং গ্রামবাসী ও কুঞ্জকে উৎসাহ দিয়েছে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে। নাটকে পঞ্চাননীর উৎসাহী কণ্ঠে শোনা গেছে-

> "জনৈক ব্যক্তি - (ঘা খেয়ে) আরেব্বাস রে, বাপ্রে বাপ্।
> সকলে সমবেত কণ্ঠে এই-ই-ই শব্দ করে পিছিয়ে যায়
> পঞ্চাননী - আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোসনে, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।
> সমবেত কণ্ঠে-ও-ও-ও শব্দ করে জনতা এগিয়ে যায়।
> এগিয়ে যা, এগিয়ে যা সব। ..."[৮]

পঞ্চাননী প্রতিবাদী, তার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র কুঞ্জের স্ত্রী রাধিকা সেও প্রতিবাদী। রাধিকার প্রতিবাদ আত্মসম্মান রক্ষার, প্রতিবাদ নারীর অধিকার রক্ষার। দুর্ভিক্ষ অনাহারে যখন গ্রাম বাংলার সকল পরিবার বিপর্যস্ত, তখন রাধিকা ধৈর্যের সঙ্গে অভাবের মধ্যে, মনোমালিন্য হলেও হিসাব করে পরিবার চালাতে সক্রিয় থেকেছে। অনাহারে থেকেও পরিবারের সকলের জন্য নিরন্তর পরিশ্রম ও সংগ্রাম করে গেছে। অভাব তার শরীরকে জরাগ্রস্ত করেছে পথ্যের সংস্থান না হলেও সহনশীল নারী রাধিকা প্রতিবাদ করেনি, মুখ বুজে সহ্য করেছে শারীরিক যন্ত্রণাকে। কিন্তু আমরা দেখি কুঞ্জু যখন সংসার চালানোর জন্য রাধিকার মায়ের মল জোড়া বিক্রি করতে চেয়েছে তখন রাধিকা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে, গর্জে উঠেছে -

> "রাধি - তা সেকি আর আমি বুঝিনি! মনে তোমার অনেকক্ষণই পড়েছে, শুধু আমার বাপের বাড়ির জিনিস বলে চক্ষু লজ্জার খাতিরে একটু ভনিতে করলে। কিন্তু সে মল আমার মায়ের দেওয়া। তার কথা মনে করে তুলে রেখেছি। সে আমি কিছুতেই দেব না। আর সবই তো খেয়েছ। এখন সেই মল জোড়ার উপর টনক নড়ছে। হা অদেষ্ট!
> কুঞ্জ - না দিবি না দিবি, তা বলে হা অদেষ্ট হা অদেষ্ট করিস্নি, হ্যাঁ!কুঞ্জ সমাদ্দার এখনও বেঁচে আছে, মরেনি।
> রাধি - বেশ তো, তারই প্রমাণ দিক; সে তো আমার সৌভাগ্যি।"[৯]

রাধিকার এই প্রত্যাখ্যান রাধিকার আত্মসম্মান ও অধিকার বোধকেই প্রকট করে তোলে। মায়ের স্মৃতি মেয়ের অহংকার এবং অধিকারের স্থল তারা রাধিকা কুঞ্জ কে তীব্র প্রতিবাদী ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে একজন নারীর কাছে শুধু তার মা নয়, স্বামীও যে তার সম্মান ও অহংকারের আশ্রয় তা কখনোই রাধিকা বিস্তৃত হয়নি। তাই আমরা দেখি দারিদ্রতা, অভাব-অনাহারের মধ্যেও রাধিকা কুঞ্জকে ছেড়ে যায়নি। যোগ্য স্ত্রী হয়ে পাশে থেকেছে, সব সময় কুঞ্জকে সাহস জুগিয়েছে। পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই-এ কুঞ্জের যোগ্য সহযোদ্ধা হয়েছে তার স্ত্রী রাধিকা। প্রকৃত পক্ষে স্বামীর সঙ্গে রাধিকার এই লড়াই পুরুষের সঙ্গে নারীর পা মিলিয়ে চলার লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই।

এছাড়াও এই নাটকে নিরঞ্জনের স্ত্রী বিনোদিনীর লড়াই ও আমাদের চোখে পড়ে দুর্ভিক্ষ ও অভাবের মধ্যে পড়ে আমরা দেখি চন্দর কে তার মা মরা মেয়েকে হারু দত্তের কাছে বিক্রি করে দিতে সেই পরিস্থিতিতে নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করা কতটা কঠিন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সেই পরিস্থিতির মধ্যে বিনোদিনী টাউটের ফাঁদে পড়ে কালীধনের সেবাশ্রমে আশ্রিত হলেও আত্মসত্ত্বাকে সে রক্ষা করতে পেরেছিল। নিরঞ্জনের সঙ্গে সেবাশ্রমে দেখা হবার পর আবার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে-

"বিনোদিনী- আমি যাব, আমাকে ছেড়ে দাও। দাও, আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাব।

রাজীব - (বাধা দিয়ে) আর এইডা কি কর! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দরমহলে। বাইরে যাবা ক্যান? যাও ভিতরে যাও। - কি আশ্চর্য!

বিনোদিনী - ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি যাব। - যেতে দাও আমাকে।"[১০]

আমরা দেখি নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবার পর বিনোদিনী স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে থেকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কালিধনের কালোবাজারির মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে নারী সংযমের পরিচয় দিয়ে কীভাবে পুরুষের শক্তি হয়ে ওঠে তা বিনোদিনীকে দেখে আমরা অনুধাবন করতে পারি। শুধু তাই নয় আমরা দেখি অভাব, অনাহার, সামাজিক নিরাপত্তাহীন তার মধ্যেও বিনোদিনী আত্মসম্মানের লড়াই-এ নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। আর লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই ঘরছাড়া, ঘরহারা অসহায় নারী বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত স্বামীর গৃহে ফিরে এসেছে।

চল্লিশের দশক পরাধীন ভারতবর্ষের এক চরম অস্থিরতার সময়। পরাধীনতার দাসত্ব, থেকে মুক্তির জন্য সাধারণ জনমানসের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনাহার সমস্ত কিছুর মধ্যে সাধারণ জনসমাজ বিপর্যস্ত। সেই বিপর্যস্ত সমাজকে টিকিয়ে রাখতে এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা তথা প্রতিরোধের প্রয়োজন ছিল। আমরা সম্মিলিত সেই প্রতিরোধের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই এই 'নবান্ন' নাটকটিতে। সমাজের বিপর্যয়ে সমাজকে টিকিয়ে রাখতে নারীরা যে কীভাবে পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে তাও আমরা অনুধাবন করতে পারি পঞ্চাননী রাধিকা এবং বিনোদিনের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে। চতুর্থ অঙ্ক থেকেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার। অসীম নির্যাতন, মহামারীর যন্ত্রনা, কালোবাজারির প্রকোপ - সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে মানুষের উত্তরণ ঘটে; মানুষ গ্রামে ফিরে আসে। তাঁরা জোট বাঁধে, নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে সম্মিলিত প্রতিরোধ ছাড়া এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। নিরঞ্জন-প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে প্রতিরোধ। প্রতিরোধের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নতুন করে ধান চাষের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যুধিষ্ঠিরের শেখানো বুলির পরিবর্তে নিজ অভিজ্ঞতা উপর বিশ্বাস রেখে নিজেরাই আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করে। 'ধর্মগোলা' বা ধানের গোলা তৈরী করে তাতে ধান জমা করে নবান্ন উৎসবের প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমিনপুর গ্রামের মানুষেরা হঠাৎ করে তৈরী হওয়া প্রতিকূল পরিস্থিতির কথাও ভোলেনা। তারা বুঝতে পারে, শুধু ফসল ফলালেই সমস্যার সমাধান হবেনা। এর জন্য চাই সংঘবদ্ধতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। সম্মিলিত প্রতিরোধের মাধ্যমেই ভবিষ্যত সমস্যার সমাধান সম্ভব। মন্বন্তরের বিপর্যয় দিয়ে নাটকের শুরু হলেও নাটকের শেষে নবজীবনের মহামন্ত্রের জয়গান শোনা যায়। বিপর্যস্ত মানুষ গ্রামে ফিরে এসে নতুনকরে সংঘবদ্ধভাবে বাঁচার ও প্রতিরোধের শপথ নিয়েছেন। মন্বন্তরের, শোষণ- ইত্যাদি চরম প্রতিকূল পরিস্থির মধ্যেও মানুষ নতুন ধান উৎপাদন করে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করেছে। এইভাবে অসহায়তা, প্রতিকূলতা, দুর্ভিক্ষ ও সমস্যার মধ্যে দিয়ে নাটকের শুরু হলেও পরিণতিতে নাটকটি হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নাটক।

Reference :

১. চৌধুরী, দর্শন, গণনাট্য আন্দোলন, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, অনুষ্ঠপ প্রকাশনী, ১৯৯৪) পৃ. ১

২. চৌধুরী, দর্শন, গণনাট্যের নবান্ন : পুনর্মূল্যায়ন, রাধারাণী সাধুখাঁ ও কেকা সাধুখাঁ কর্তৃক প্রকাশিত, বামা পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ ১৫ই আগস্ট ১৯৯৭, ১১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১০৬

৩. ভট্টাচার্য, নবারুণ, ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ, প্রকাশক, সুধাংশুশেখর দে, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৫, জুলাই ২০০৮, দেজ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৩

৪. তদেব, পৃ. ১০১

৫. ইসলাম, কাজী নজরুল, নজরুল রচনাবলি জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, মে ২০১১, পৃ. ৮৯

৬. রায়, অন্নদাশঙ্কর, প্রবন্ধ, প্রকাশক: শ্রী গোপালদাস মজুমদার, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, আশ্বিন ১৩৭১, পৃ. ৬৬৩-৬৬৪

৭. ভট্টাচার্য, নবারুণ, ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ, প্রকাশক, সুধাংশুশেখর দে, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ, ১৪১৫, জুলাই ২০০৮, দেজ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৩

৮. তদেব, পৃ. ৪৫-৪৬

৯. তদেব, পৃ. ৪৮

১০. তদেব, পৃ. ৮৪